Annual History Prizes
Awards Ceremony
&
The Dr. S. L. Bhyrappa Memorial Lecture

Powered by NAAV AI

মাননীয়া শ্রীমতি নির্মলা সীতারমণ জির দ্বারা ডঃ এস. এল. ভৈরাপ্পা স্মারক উদ্বোধনী বক্তৃতা

নমস্কার। বিক্রম সম্পত, রাজলক্ষ্মীজি, দেবেশ বর্মাজি এবং অত্যন্ত নিবিষ্ট এক বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই সবকিছুকে একসাথে গুছিয়ে আনার জন্য বিক্রম, আমার জানা মতে বিগত ১২-১৩ বছর ধরে, অত্যন্ত কঠোর এবং গভীরভাবে নিবেদিত সাংগঠনিক কাজ করেছে। আর আমি আজকের বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাই।

এটি এমন একটি উদ্যোগ যা, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, একটু দেরিতেই শুরু হয়েছে। তবে এটা বিক্রমের প্রচেষ্টাকে ছোটো করার জন্য নয়; ভারতের অন্তত চার বা পাঁচ দশক ধরে এই ধরণের একটি প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। আমরা এটি থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এবং প্রকৃতপক্ষে, চার বা পাঁচ দশক ধরে এই ধরণের প্রচেষ্টা থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে বিরোধীরা ইতিহাস প্রচারের ক্ষেত্রে বা আমাদের সামাজিক জীবনকে অত্যন্ত আলাদা এবং অসত্য উপায়ে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমি আজ বলার সময় অবশ্যই আংশিকভাবে এর উল্লেখ করব।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং আজ তাঁর জন্মদিন— অবশ্যই, ভারত আজকের দিনটিকে শিক্ষকদিবস হিসেবে উদযাপন করে, যেখানে আমরা গুরুপূর্ণিমাকে আমাদের শিক্ষকদিবস হিসেবে উদযাপন করি। রাধাকৃষ্ণন, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ভারতের বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ব্যাপক গুণগ্রাহিতার জন্য, ৫ই সেপ্টেম্বর অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস আমাদের বলে যে এটিও শিক্ষক দিবস। তাই শিক্ষকদের যেকোনো দিনই শ্রদ্ধা জানানো যেতে পারে— গুরুপূর্ণিমা এবং ৫ই সেপ্টেম্বর দু'দিনেই। তাই আজ সকালে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে এমন অনেক বিষয়, যা আমাদের

প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্ম— সে জেন-জি হোক বা জেন-আলফা— উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে কথা বলতে পারাটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের।

এবং আমি বিক্রমকে আবারও ধন্যবাদ জানাই দিল্লিতে এইরকম প্রবল বৃষ্টির দিনে এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আমি নিশ্চিত যে বিক্রমের সমস্ত অসাধারণ কাজের কথা শোনার জন্য আরও অনেক বেশি মানুষ এখানে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু চিন্তাবিদ এবং শিক্ষক অবিচ্ছেদ্য, তাই আমরা উভয়কেই শ্রদ্ধা করি। আর স্মারক বক্তৃতায় ডঃ বৈরাপ্পা সম্পর্কে বলার আগে, আজকের পুরস্কার এবং পুরস্কারগুলোর নামকরণের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এঁরা তিনজন— তিন মহান নায়ক যারা মনোবল অটুট রেখেছিলেন, তিনি আর.সি. মজুমদার হোন, এস.এল. বৈরাপ্পা বা অনন্ত পাই।

এই পুরস্কারগুলোর নামকরণই আমাদের বলে দেয় যে ভারতের সামাজিক ও ঐতিহাসিক সাধারণ মানুষ এবং সেইসঙ্গে ভারতের সেই অভিজাত শ্রেণী— যারা নির্ধারণ করত আমাদের ইতিহাসের বইয়ে কী থাকবে, আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে কী যাবে, আমাদের সাংস্কৃতিক একাডেমিগুলোতে কী স্থান পাবে ইত্যাদি— কোন মহীরুহদের বাদ দিয়েছেন। তাই এই নামকরণ আপনার পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সহমর্মী একটি প্রচেষ্টার যোগ্য, বিক্রম। এটি অত্যন্ত অর্থবহ যে ভারত এস.এল. বৈরাপ্পাকে একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে বা এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে উদযাপন করতে শুরু করেছে যিনি আমাদের এমন এক ভারতে চলার পথ দেখিয়েছেন, যা তাঁর আদর্শ অনুসরণকারীদের জন্য ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল।

১৯৬৬ সালে বরোদার মহারাজা সোয়াজি রাও বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া তাঁর ডক্টরাল থিসিসের শিরোনাম 'সত্য মত্তু সৌন্দর্য', যার অর্থ সত্য এবং সৌন্দর্য তাঁর সমগ্র ভাগ্যকে নির্ধারণ করেছিল। তাঁর

জ্ঞানার্জনের যাত্রাটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। বৈরাপ্পা তাঁর আত্মজীবনী 'ভিত্তি'-তে নিজের শৈশবের কথা বলেছেন; চরম দারিদ্র্য, অল্প বয়সে মাকে হারানো, এক অশান্ত গৃহকোণ এবং প্লেগের সময় ভাইবোন ও আত্মীয়দের হারানোর বেদনায় দীর্ণ। নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন এক জীবন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাই রাজ্যের নানা অংশে নানা সময়ে আত্মীয়দের দ্বারা তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। চরম কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান। তাঁর যাপিত জীবনের এই বাস্তবতাই—তিনি এর মধ্যে দিয়ে বেঁচে ছিলেন—তাঁর লেখাকে পরিপক্ক করেছে। তিনি তিক্ত ছিলেন না। সংযম, এক আবেগহীন বাস্তববাদ তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই যাপিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রস্তুতির এক অসাধারণ কঠোরতা। বৈরাপ্পা কোনো জগৎ সম্পর্কে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখতেন না, যতক্ষণ না তিনি নিজে সেখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে তাঁর প্রধান উপন্যাস 'মন্দ্র' লেখার আগে—আর এখানে বিক্রমও সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে কাজ করছেন—তিনি নিজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন এবং কণ্ঠশিল্পীদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন।

তাই, কোনও বিষয়ে লেখার আগে সেই অভিজ্ঞতাটি তিনি নিজে যাপন করতে চাইতেন। এই কারণেই যখন তিনি এই নিয়ে লিখেছিলেন, তা সত্য ও আন্তরিক এবং তাঁর লেখা প্রতিটি শব্দে আপনারা তা সরাসরি অনুভব করতে পারতেন। তাই, তিনি গায়কদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থেকে ছিলেন। তিনি শিল্পকলা এবং সেই জগতের পেছনের জীবনকে বুঝতে চেয়েছিলেন—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা এবং সেই জগতের ভেতরের জটিল সম্পর্কগুলো। তাঁর অন্য একটি ধ্রুপদী উপন্যাস 'পর্ব'-এর জন্য তিনি মহাভারতের সাথে জড়িত স্থানগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন, যার মধ্যে কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনাপুরও অন্তর্ভুক্ত। তিনি হিমালয় অঞ্চলের এমন কিছু সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ফ্র্যাটার্নাল পলিয়্যান্ড্রি (একজন মহিলার সঙ্গে এক পরিবারের সব ভাইদের বিবাহের প্রথা) বর্তমান ছিল, তাদেরকেও নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

তিনি মহাভারত লিখতে পারতেন, তিনি সমস্ত গৌণ উৎসগুলো দেখতে পারতেন, তিনি ভারতে ইতিমধ্যে এত ভাষায় লেখা বিভিন্ন মহাভারত বিশ্লেষণ করতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি সেই জায়গাগুলোতে গিয়েছিলেন। তিনি ওই মানুষদের সঙ্গে একাত্মতার বোধ অনুভব করতে চেয়েছিলেন। একজন লেখক, যিনি তাঁর পাঠকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ করতে চান, তিনি যে সীমা পর্যন্ত যান, যে কষ্ট সহ্য করেন; তা আপনাকে লেখক সম্পর্কে অনেক বেশি কিছু বলে, এমনকি বইটা যা বলতে পারে তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। কিন্তু বৈরাপ্পা ছিলেন সেই ধাতুতে গড়া। তা তাঁকে প্রশ্ন করতে দিয়েছিল যে এই ধরণের পরিবার এবং পারিবারিক কাঠামো স্নেহ, কর্তব্য, ঈর্ষা এবং সেইসঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে কীভাবে কতটা নির্মাণ করে।

সুতরাং তিনি প্রথমে সেই জগতে প্রবেশ করেন, এবং কেবল তারপরই তিনি আমাদের জন্য এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন। এই নিমজ্জনই তাঁর কাজের অন্যতম প্রধান শক্তির ব্যাখ্যা দেয়: অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তিনি মানুষের সম্পর্কগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চরিত্রগুলো কখনোই আদর্শের ছাঁচে গড়া নয়। আমরা দেখতে পাই চাপের মুখে মানুষের প্রতিক্রিয়া, কর্তব্য ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত আর অনুভূতির একটি ছোট্ট পরিবর্তনে একটি সম্পূর্ণ সম্পর্কের বদল। পাঠক কেবল আখ্যানটি অনুসরণ করেন না; পাঠক এর মধ্যে নিজের উপস্থিতি অনুভব করেন। এই পদ্ধতির পেছনে সাহিত্যের একটি স্পষ্ট দর্শন ছিল। 'নানেকে বারেয়ুত্তেনে' (আমি কেন লিখি?) নামক বইটিতে বৈরাপ্পা এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে সাহিত্যকে কোনো 'বাদ'-এর (ইজম্) হাতিয়ার হতে হবে, তা বামপন্থী হোক, ডানপন্থী বা অন্য কিছু; অথবা সামাজিক অগ্রগতির কোনো নির্ধারিত কর্মসূচির বাহন।

তাই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সাহিত্য পাঠককে রসে নিমজ্জিত করবে: বিস্ময়, দুঃখ, সাহস, কোমলতা এবং মানুষের অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিসর—যাকে আমরা নবরস বলি। এর কাজ হলো অভিজ্ঞতাকে গভীর করা এবং সংবেদনশীলতাকে পরিমার্জিত করা, কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া নয়। এই কারণেই তাঁর উপন্যাসগুলোকে মনে হয় যাপিত, নির্মিত নয়। ড. বৈরাপ্পা কীভাবে প্রথম আমার চেতনায় প্রবেশ করেছিলেন সে সম্পর্কে আমাকে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করার অনুমতি দিন। কয়েক দশক আগে, আমি 'বংশবৃক্ষ' নাটকটির একটি অভিনয় দেখেছিলাম—খুবই অপেশাদার একটি দল, কিন্তু তারা এটি মঞ্চস্থ করেছিল। দর্শকাসনে বসে সেই চরিত্রদের ঐতিহ্য ও কর্তব্যের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা, সেই অভিনয়ের উত্তেজনা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এটা তামিলনাড়ুর তিরুচিতে।

আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করছি কারণ মঞ্চটি আমার স্মৃতিতে কেবল একটি পটভূমি নয়; এটি একটি কেন্দ্রীয় রূপক যা আমি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমরা যদি ড. বৈরাপ্পার সাহিত্যিক যাত্রার দিকে তাকাই – প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধানে তার অভিজ্ঞতা পৌঁছেছিল দুটি ভিন্ন শিখরে। প্রথমটি শৈল্পিক, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৯—'বংশবৃক্ষ', 'গৃহভঙ্গ' এবং 'দাতু'-র মতো কালজয়ী সৃষ্টির যুগ, যার জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং সবশেষে 'পর্ব'। দ্বিতীয়টি ২০০৭ সাল নাগাদ জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া, যখন 'আবরণ' প্রকাশের আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এবং পাঁচ মাসে ১০ বার পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল—যা ভারতীয় প্রকাশনা জগতে একটি রেকর্ড—যেখানে 'পর্ব'-র ১৯টি সংস্করণ বেরিয়েছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বরা তাঁর ছয়টি উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। 'বংশবৃক্ষ' ১৯৭১ সালে গিরিশ কারনাডকে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল, অন্যদিকে গিরিশ কাসারাভাল্লি 'নায়ী

নেরালু'-কে পর্দায় নিয়ে এসেছিলেন। তবুও এখানেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য রয়েছে। যে সমস্ত দিকপালরা বৈরাপ্পার উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে জাতীয় সম্মান অর্জন করেছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীতে তাঁর প্রতি তীব্র সমালোচনামূলক বৈরিতা নিয়ে চড়াও হয়েছিলেন। তাঁর সততাই তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করেছিল। কেন তাঁকে এইভাবে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছিল? এর সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার কোনো সম্পর্ক ছিল না; এর সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাঁর চিন্তাভাবনা ও প্রকাশের আপসহীন সততার সঙ্গে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থে তিনি টিপু সুলতানের মতো জটিল ঐতিহাসিক চরিত্রদের বিষয়ে মহাফেজখানার নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে 'সমঝোতা' করতে অস্বীকার করেছিলেন। ৯১ বছর বয়সে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন; "টিপু মূলত ক্রূরী"— কন্নড়ে বৈরাপ্পা ঠিক এটাই বলেছিলেন – "টিপু মূলত একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি" এবং "টিপুভান্নু হিরো মাডিকোন্ডু বারেয়ুত্তারে"—যার অর্থ, তারা টিপুকে নায়ক বানিয়ে চলেছে— এটি বৈরাপ্পারই পর্যবেক্ষণ। আর এই ধরণের বৌদ্ধিক সততা, ঐতিহাসিক নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করার সততা এবং তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সততাই তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সবার জন্যই তাঁকে এই গণ্ডিতে ফেলে দেওয়া সুবিধাজনক ছিল যে, "ওহ, তিনি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা একটি ভিন্ন ইতিহাস নিয়ে আসতে চায়, যেখানে এটাই ইতিহাস যা আমরা আপনাদের দিতে চাই। এটি গ্রহণ করুন, মেনে নিন অথবা বর্জন করুন। কিন্তু না, আমরা অন্য কোনো ইতিহাসকে জায়গা দেব না।" সেই অন্য ইতিহাসটি কিন্তু 'অন্য' কিছু নয়— প্রকৃত সত্য। বৈরাপ্পার এই কথাগুলো আমার নিজের নয়। তিনি ২০২২ সালের ১৪ই নভেম্বর মহীশূরে এটি বলেছিলেন। আমি নিশ্চিত আপনারা সেই বিবরণগুলো পেয়ে যাবেন, এবং তিনি এটি 'টিপু নিজ কনসুগলু' নাটকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন। মূলত মহাফেজখানার গবেষণালব্ধ বক্তব্যকে রাজনৈতিক রূঢ়তা হিসেবে আক্রমণ করা হয়েছিল। তবুও তিনি সর্বদা তাঁর শিল্পের সীমানা সম্পর্কে স্পষ্ট ছিলেন।

"বারেয়ুভুদু নান্না মাধ্যম, নানু বারেয়ুত্তেনে, বেঙ্কি হাকুদিল্লা"—কন্নড়ে এর অর্থ "লেখাই আমার মাধ্যম। আমি লিখি। আমি কোথাও আগুন লাগাই না।" ২০১৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি নৃপতুঙ্গ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেছিলেন। সুতরাং ড. বৈরাপ্পাকে কোনোভাবেই নীরব করে দেওয়া যায়নি, তবে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাক্রমের স্তরে এক ধরণের দ্বাররক্ষণ বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছিল। কর্ণাটকে 'নব্য' আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ইউ.আর.অনন্তমূর্তি তাঁকে—অর্থাৎ ভৈরাপ্পাকে—খারিজ করে দিয়েছিলেন, একজন ঔপন্যাসিকের চেয়ে একজন তার্কিক হিসেবেই। ২০০৭ সালের মে মাসের কোনো এক সময়ের কথা, যখন অনন্তমূর্তি ভেবেছিলেন যে ভৈরাপ্পা কেবল তর্কই করতে পারেন, ঔপন্যাসিক হিসেবে কোনো লেখালেখি করতে পারেন না—এই কথা বলে তাঁকে খাটো করা উচিত।

কন্নড় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি চন্দ্রশেখর পাতিল 'আবরণ'-কে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অবমাননাকর আক্রমণ করেছিলেন। সাধারণ পাঠক সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক দ্বাররক্ষকরা তা করেনি। তবুও সেই কায়েমী ব্যবস্থা তাঁকে তাদের নিজস্ব মনোনীত ব্যক্তিত্বদের সমকক্ষ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছিল। যে সমালোচকরা তাঁকে সবচেয়ে কঠোরভাবে বিচার করেছিলেন, তাঁরা জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন; কিন্তু বৈরাপ্পা তা কখনোই পাননি। এটি আমাদের সরাসরি জাতীয় ও বৌদ্ধিক আলোচনার শব্দভাণ্ডারের একটি মৌলিক বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়। প্রচলিত রাজনৈতিক শব্দকোষে আমরা সহজেই বিভিন্ন রূপভেদের কথা বলি: আমরা রক্ষণশীল উদারপন্থী, উদার উদারপন্থী এবং চরমপন্থী উদারপন্থীর কথা শুনি। এগুলো হলো এমন কিছু তকমা যা মানুষকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বন্দি করার জন্য দেওয়া হয়।

তবুও দেখুন আধুনিক ভারতে কীভাবে এই মাপকাঠিটি একতরফাভাবে প্রভাবিত করা হয়: একজন ভারতীয় রক্ষণশীল উদারপন্থী যিনি মহাফেজখানার নথিভুক্ত তথ্য উপস্থাপন করেন, তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে একজন চরম ডানপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। লক্ষ্য করে দেখুন যে, চরমপন্থার এই তকমাটি কখনোই অন্য পক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। একজন নিরপেক্ষ, স্পষ্টভাষী এবং তথ্যনির্ভর গবেষককে কখনোই মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে দেওয়া হয় না, তাঁকে কখনোই মধ্যপন্থী উদারপন্থী, স্পষ্টবাদী উদারপন্থী বা সৎ উদারপন্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। আমাদের জনপরিসরের আলোচনায় এমন কোনো মাপকাঠি নেই যার কোনো মধ্যবিন্দু রয়েছে। মনে হয় যেন "উদারপন্থী" শব্দটি কেবল তাদেরই ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়েছে যারা ভারতীয় সমাজকে শুধুমাত্র একটি

বামপন্থী আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। সুতরাং বামপন্থী আদর্শের দৃষ্টিকোণ—এবং এখানে উপাচার্য শান্তিশ্রীকে প্রতিদিন এর মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এটিই খাঁটি ভারতীয় উদারনৈতিক মূল্যবোধ এবং একটি চাপিয়ে দেওয়া উদারতাবাদের মধ্যবর্তী চ্যুতিরেখা। প্রথমটি 'পূর্বপক্ষ'-এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিতর্কের এক প্রাচীন অভ্যাস—যা খণ্ডন করার আগে আপনার প্রতিপক্ষের যুক্তিকে তার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুনির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপন করার দাবি রাখে। এটিই ভারতীয় ঐতিহ্য; পূর্বপক্ষ এটিই ব্যক্ত করেছিল। দ্বিতীয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যপদ কার্ড, যেখানে একজন স্বঘোষিত দ্বাররক্ষক ঠিক করেন কে মঞ্চে প্রবেশাধিকার পাবেন আর কে পাবেন না। একটি আত্মবিশ্বাসী সভ্যতার জন্য তার জনপরিসরের আলোচনা একটি উন্মুক্ত মঞ্চের মতো হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চের বাম দিকে জায়গা থাকতে হবে, ডান দিকেও থাকতে হবে এবং সর্বোপরি, কেন্দ্রে একটি স্থান থাকতে হবে।

চিন্তাবিদরা অবশ্যই উভয় দিক থেকেই প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁরাই অভিনেতা; তাঁরা মঞ্চে আসবেন, আপনাদের সামনে তা ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা কেন্দ্রে থাকবেন। ডান দিকে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রে। সুতরাং চিন্তাবিদদের উভয় দিক থেকেই প্রবেশ করতে পারতে হবে, তাঁদের যুক্তিগুলোকে মঞ্চের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে এবং ধারণাগুলোকে উন্মুক্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে হবে। চিন্তা করা এবং একটি মতামত গঠন করা দর্শকদের ওপর নির্ভর করে। আমাদের স্মৃতি একে 'মন্থন' বলে—একটি বৌদ্ধিক সমুদ্রমন্থন। ঠিক যেভাবে দেব ও অসুররা মন্দার পর্বতের দুই পাশে অবস্থান নিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই বিপরীতমুখী শক্তির ঘর্ষণের মাধ্যমেই সত্যের অমৃত উদীয়মান হয়েছিল। আর এটাই আমাদের দর্শন, এটাই আমাদের ঐতিহ্য, এটাই আমাদের ডিএনএ-তে রয়েছে।

সেই নাটকের কখনো শেষ হয় না। এটি দর্শকদের মনে প্রশ্ন এবং স্বাধীন অনুসন্ধানের বীজ বুনে দিয়ে বাড়ি পাঠায়। সুতরাং, দর্শকরা দেখেন যে উভয় পক্ষই মন্থন করে চলেছে, প্রত্যেকে নিজের নিজের দিক থেকে টানছে। আর যা কিছু উঠে আসে, তা দর্শকদের দেখার জন্যই থাকে। তবে কয়েক দশক ধরে, আমাদের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশ ব্যবস্থা মঞ্চের একটি পক্ষকে অসমভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়েছিল, যেখানে চিন্তাভাবনার বিকল্প ঐতিহ্যগুলোকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল—সাহিত্য, শিক্ষাঙ্গন, সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র সর্বত্র। একটি পক্ষের, একটি আদর্শগত পক্ষের এই অসম উপস্থিতি এতটাই তীব্র ছিল যে তা অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিতে পারত, কিন্তু বৈরাপ্পার মতো অল্প কয়েকজন ছিলেন।

কেবল এক পক্ষের অভিনেতাদের নিয়ে গঠিত মঞ্চ কোনো নাটক তৈরি করে না; এটি একটি আদর্শগত 'একক-বক্তব্য' প্রদান করে। ড. বৈরাপ্পার বৌদ্ধিক সাহস এখানেই যে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন অন্য প্রান্তটিও পূর্ণ থাকে। যখন প্রাতিষ্ঠানিক জুরিরা বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ পাঠকের সরাসরি সমর্থনে বাইরে থেকে সেই বাধা ভেঙে চুরমার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন দ্বিতীয় প্রান্তটিরও এক প্রাণবন্ত দর্শকশ্রেণী আছে, যাদের অস্তিত্বই নেই বলে শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছিল। কিন্তু অস্বীকৃতির এই স্থাপত্য—আমি এটিকে আলোচনার প্রধান বিষয় হিসেবে ছেড়ে যেতে চাই যা এই দেশে অব্যাহত থাকা উচিত।

এই সবকিছুরই শিকড় অনেক গভীরে। ১৯৪৭ সালের আগেই ভারতের বৌদ্ধিক মঞ্চ থেকে অন্যদের হটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটি শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনায়। আপনারা পূর্ববর্তী বক্তা, যিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর মুখে শুনেছেন যে কোন কোন পর্যায়ে এই অস্বীকৃতি জেঁকে বসেছিল। আমি এখানে তা বলতে চাইনি, তবে আজকের ইতিহাস যেমন, বিক্রম ঠিকই বলছিলেন যে আজকের পুরস্কারগুলোতে বাংলার আধিপত্য রয়েছে। বাংলা, যে যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা শুনি যখন ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ লড়েছিলেন, পলাশী, আমরা যে ইতিহাস পড়ি তাতে কখনোই বাংলার পরাজিত শাসকের ক্রূরতার কথা বলা হয় না, যেমনটা টিপুর ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল।

আমাদের ভাগ্য দেখুন, পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ যেখানেই গিয়েছিলেন, বাংলার মানুষ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই ক্রূরকে পরাজিত করার জন্য। দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এগুলো এমন ইতিহাস যা দেখানো হয় না, অথবা আপনারা সম্ভবত শুনবেন যে একজন ভারতীয় রাজা, একজন জাতীয়তাবাদী রাজা একজন ইংরেজ বণিকের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা এই পরাজিত ব্যক্তির ক্রূরতার কথা শুনতে পাবেন না। এটি ক্লাইভকে মহান করে তোলে না। কিন্তু সত্য এটাই যে, এভাবেই ইতিহাসকে ধুয়েমুছে সাফ করা হয়েছে। সুতরাং, ভারতীয় শিক্ষার ওপর তাঁর স্মারকপত্রে মেকলে দাবি করেছিলেন, "আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকে পাইনি", আমি উদ্ধৃত করছি, "আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকে পাইনি যিনি এটি অস্বীকার করতে পারেন যে একটি ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটিমাত্র তাক ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের সমতুল্য।"

"সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমস্ত বই থেকে সংগৃহীত সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য, ইংল্যান্ডের প্রিপারেটরি স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত সবচেয়ে তুচ্ছ সংক্ষিপ্তসারগুলোর চেয়েও কম মূল্যবান।" উদ্ধৃতি সমাপ্ত। আমি

আশা করি এই উদ্ধৃতিতে যে অর্থহীন কথা বলা হয়েছে তার ভয়াবহতা আমাদের মাথায় ঢুকেছে। এবং এটি ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জেনারেল ডিপার্টমেন্টে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত নথিপত্রের সংকলন থেকে। তিনি সেই স্মারকপত্রটি শুরুই করেছিলেন এটি স্বীকার করে—এর পরিহাস এবং ঔদ্ধত্যটা দেখুন। তাঁর লেখা স্মারকপত্রটি এই লাইন দিয়ে শুরু হয়, "সংস্কৃত বা আরবি কোনো ভাষা সম্পর্কেই আমার কোনো জ্ঞান নেই।"

কিন্তু কী দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি উপসংহার টেনেছিলেন! তিনি প্রথমে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলেন এবং ঠিক তারপরেই তাঁর রায় দিয়ে দিলেন। এবং কোনো পর্যায়েই তিনি প্রমাণ খোঁজার কষ্টটুকু করেননি। এইভাবে একটি নির্ণয়ে পৌঁছানো হচ্ছে বিচার শুরু হওয়ার আগেই একটি সাজা দিয়ে দেওয়া। এবং এটিই একটি উপমহাদেশের শিক্ষানীতি হয়ে উঠল। ১৮১৭ সালে জেমস মিল 'দ্য হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' প্রকাশ করেন। এটি হেইলিবেরি কলেজের একটি মান্য পাঠ্যপুস্তক, যেখানে কোম্পানি সেইসব ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিত যারা আমাদের শাসন করার জন্য আসত। জেমস মিল ১৮১৭ সালে 'হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' লিখেছিলেন ভারতে কখনো পা না রেখে বা কোনো ভারতীয় ভাষা না শিখেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে আজীবন নিজের চোখ ও কান খোলা রেখে যা শিখতে পারবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি ইংল্যান্ডে নিজের পড়ার ঘরে বসে এক বছরেই ভারত সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আর এর বিপরীতে দেখুন আমি বৈরাপ্পা সম্পর্কে যা বলেছিলাম—কীভাবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে থেকেছেন, প্রেক্ষাপট বুঝেছেন এবং তারপর বইটি লিখেছেন। অথচ তাঁকে একটি গণ্ডির মধ্যে আটকে ফেলা হয় এবং আমাদের ক্রমাগত এটাই শেখানো হচ্ছে। আমাদের স্কুল ও কলেজগুলোতে এটাই বোঝানো হচ্ছে। যে সভ্যতাকে তাঁরা খারিজ করে দিচ্ছিলেন, তা হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত উন্নত ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ করে আসছিল। ১১৪৮ থেকে ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরে বসে কলহন ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করার উল্লেখ করে 'রাজতরঙ্গিণী' শুরু করেছিলেন। আর তিনি কী বলছেন? সংস্কৃতে বলা, আমি অনুবাদ করছি। তিনি বলেন, কেবল সেই মহৎ ব্যক্তিই প্রশংসার যোগ্য। কেবল সেই মহৎ ব্যক্তিই প্রশংসার যোগ্য, যাঁর বাণী অতীত ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে একজন বিচারকের মতো নিরপেক্ষ থাকে।

১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলহনের রাজতরঙ্গিণীর নথি। আর কয়েক শতাব্দী পরে মেকলে এসে বলছেন যে তিনি সংস্কৃত বা আরবি জানেন না, কিন্তু তবুও তিনি এটার ওপর রায় দিয়ে দেবেন। এটি বস্তুনিষ্ঠতার এমন একটি সংজ্ঞা—রাজতরঙ্গিণীর এই সংজ্ঞাটি যা আমি আপনাদের বললাম— তা মেকলের আট শতাব্দী আগে সংস্কৃতে লেখা বস্তুনিষ্ঠার এমন এক সংজ্ঞা যা যেকোনো আধুনিক ঐতিহাসিক সানন্দে গ্রহণ করবেন। যখন আর. জি. ভাণ্ডারকর, কে. পি. জয়সওয়াল এবং হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতরা এই দেশীয় নথিপত্রগুলো উদ্ধার করেছিলেন, তখন তাঁরা ভারতের কঠোর ঐতিহাসিক সচেতনতা প্রদর্শন করেছিলেন। এখন আপনাদের কাছে এমন একটি নতুন প্রজন্ম রয়েছে যারা এই কাজটি করছে। তাঁরা এখানে আমার সামনে উপস্থিত আছেন এবং আমার শরীরে কাঁটা দেয়। আমাদের ঐতিহাসিকরা, সেই ঐতিহ্য ক্রমশ নিজের স্বকীয়তা ফিরে পাচ্ছে এবং এটাই যা আমরা স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক দশক ধরে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তাহলে ১৯৪৭ সালের পর কী ঘটেছিল এবং তা প্রত্যাখ্যান করার মূল্য কী ছিল? কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করতে পারতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক উপনিবেশমুক্তকরণও আসবে, কিন্তু তা ঘটেনি এবং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছিল "পঞ্চ প্রাণ, এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন, ঔপনিবেশিক সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসুন।" তাঁকে এখন এটি বলতে হয়েছে। ছয়ের দশকের শেষ দিকে এবং সাতের দশকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, আইসিএইচআর, এনসিইআরটি, আইসিএসএসআর-এর মতো শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদগুলো বিভিন্ন নেটওয়ার্কের আদর্শগত দুর্গে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের বিপুলভাবে সমর্থন করা হয়েছিল—তহবিল, পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে।

এবং ফলস্বরূপ তাঁরা এমন অনেক কিছু করতে সফল হয়েছিলেন যা আজ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে উপড়ে ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এতটাই গভীরভাবে জাঁকিয়ে বসেছেন। এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রতিটি যুগে শ্রেণীসংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক নিয়তিবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। রোমিলা থাপার, 'অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া', ১৯৬৬; আর. এস. শর্মা, 'অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া', ১৯৭৭; সতীশ চন্দ্র, 'মিডিয়েভাল ইন্ডিয়া', ১৯৭৮; বিপিন চন্দ্র, 'মডার্ন ইন্ডিয়া', ১৯৭১। বাহ! খণ্ডের পর খণ্ড এবং সেগুলোর প্রচার ও নির্দেশিকা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো হচ্ছিল। সেগুলোই মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল যাকে ঘিরে চারপাশের সবকিছুর বর্ণনা করা হতো। বিজয়নগর, পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, আহোম,

মারাঠা এবং আমাদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যগুলোর সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে পাদটীকায় নামিয়ে আনা হয়েছিল, যেখানে বিজেতাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল পুরো অধ্যায়।

আর সেই সরকারি নীতি প্রত্যাখ্যান করার মূল্য ১৯৬৯ সালে খোদ বৈরাপ্পা নিজেই পেয়েছিলেন। আমরা বৈরাপ্পার ওপর তৈরি ভিডিওর একটি অংশে তা দেখেছি। জাতীয় সংহতির ব্যানারে পাঠ্যপুস্তক, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যালোচনা করার জন্য কূটনীতিবিদ জি. পার্থসারথির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কমিটি যখন কাশী বিশ্বনাথ এবং মথুরা মন্দির ধ্বংসের নথিভুক্ত উল্লেখগুলো বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়, ড. বৈরাপ্পা মৌলিক নীতির ভিত্তিতে আপত্তি জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী কাশী ও মথুরায় যান এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদগুলো নিজেদের চোখেই দেখতে পান।

তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, ইতিহাস যদি সত্যের ওপর ভিত্তি করে না হয়, তবে এর মূল্য কী? এবং এটি আমি ২০০৬ সালের ৮ই অক্টোবর 'বিজয় কর্ণাটক'-এ প্রকাশিত বৈরাপ্পার নিজস্ব বিবরণ থেকে সংগ্রহ করেছি। কূটনীতিবিদ জি. পার্থসারথি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করেছিলেন যে আপত্তিগুলো একাডেমিকভাবে বৈধ ছিল, কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণেই এগুলো বাদ দেওয়া প্রয়োজন; আর এই কারণেই আমি বলি যে ইতিহাস বিকৃতকারী ঐতিহাসিকদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বিরাট এবং তা খোদ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই ছিল। বৈরাপ্পা পিছু হটতে অস্বীকার করেন এবং প্রায় এক পক্ষকাল পরে তাঁকে ছাড়াই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়, যা তিনি সেই সাক্ষাৎকারে বলেছেন আমরা ভিডিওটিতে দেখেছি। তাঁর জায়গায় আসেন একজন অনুমোদিত ঐতিহাসিক অর্জুন দেব।

অসততার নামে স্মৃতিকে খুব কম সময়ই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি প্রায় সবসময়ই বিচক্ষণতার নামে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ঠিক এই কারণেই এটিকে প্রতিরোধ করা এত কঠিন হয়ে পড়ে; আর এই অসামঞ্জস্য একের পর এক ভাষায় চলতেই থাকে। এই অসামঞ্জস্য তেলুগু সাহিত্যেও অব্যাহত ছিল। শ্রী শ্রী—শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও—তাঁর 'মহাপ্রস্থানম' রচনায় আমূল পরিবর্তনকামী কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি তেলুগুতে বলেন, "ই দেশ চরিত্র চুসিনা এমুন্দি গর্বকারণম? নরজাতি চরিত্র সমস্থম পরপীড়ন পরায়ণ ভাবম"। যেকোনো দেশের ইতিহাসের দিকে তাকান, আমি এই লাইনগুলো অনুবাদ করছি— যেকোনো দেশের ইতিহাসের দিকে তাকান। সেখানে গর্ব করার মতো কী আছে? মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসই হলো অন্যকে নিপীড়ন করার সাধনা। ১৯৫০ সালের 'মহাপ্রস্থানম'-এর 'দেশচরিত্রালু' কবিতায় তিনি এ কথা বলেছেন।

আরেকজন বিখ্যাত তেলুগু লেখক চলম আরও এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অন্য পক্ষে ছিলেন কবি সম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, যাঁকে পরবর্তীতে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছিল, যিনি ভারতের সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন। বিশ্বের কেন আরেকটি রামায়ণের প্রয়োজন—এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি তাঁর 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষম' শুরু করেছিলেন সেই অমোঘ প্রশ্নটি দিয়ে, "মরল নিদীল রামায়ণম্... বন্নাচ্ছো"। যার অর্থ, আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন—উদ্ধৃতিটি হল...আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে কেন আবারও রামায়ণ, তবে এই যে আমার 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষম'। তেলুগু সাহিত্যে দ্বাররক্ষকেরা যেভাবে কিছু মানুষকে সুযোগ দিতেন এবং যেভাবে অন্যদের কোণঠাসা করে রাখতেন।

বিশ্বনাথ ১৯৬২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হন, যা শ্রী শ্রী কখনোই পাননি। তাঁর পাঠক ছিল, অনুসারী ছিল; পাঠকই ছিল তাঁর সবকিছু; কিন্তু আমি আপনাদের সামনে যে রূপকটি তুলে ধরছি, সেই মঞ্চে কি এর কোনো প্রভাব পড়েছিল? না, পড়েনি; সমালোচক ও সাময়িকী, পাঠ্যসূচি এবং সাহিত্যিক মানচিত্র—সবকিছুই অন্য পক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিশ্বনাথকে একজন সংশোধনবাদী পুনরুজ্জীবনবাদী, পুরোনো ছন্দে আঁকড়ে থাকা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল; তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করা হলেও তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। সুতরাং, আপনি যদি ভেবে থাকেন যে এটি কেবল কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবে তামিলনাড়ুতে আরও খারাপ কিছু ঘটার অপেক্ষায় ছিল।

আমি একটু পরের ঘটনা থেকে শুরু করে পেছনের দিকে যাব। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বাজেট বক্তৃতায় মন্ত্রী—মনে হয় অধ্যাপক অঙ্গরন—তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে আমরা ২৮ জন লেখকের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিচ্ছি। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারির বাজেট বক্তৃতা—আমরা ২৮ জন লেখকের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলি, এই ২৮ জন লেখক কারা? আমি তাঁদের নাম বলব, তবে নাম বলার আগে বলি—এঁরা ছিলেন সেইসব লেখক যাঁরা ১৯৪৯ সাল বা তার কিছু আগে থেকে। ১৯৪৯ সালে ডিএমকে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার আগে দ্রাবিড় কলগম নামে দ্রাবিড় ঐক্যম বা দ্রাবিড় আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল, যা রাজনৈতিক দলের চেয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল।

তো তখন থেকেই, যে লেখকের লেখায় দুটি বৈশিষ্ট্য থাকত—জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুত্ববাদ, অথবা হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্য, তা রামায়ণ হোক বা মহাভারত, লেখার মধ্যে এগুলোর যেকোনো একটির প্রভাব থাকলেই সেই লেখকদের কোণঠাসা করা হতো, তাঁদের উপেক্ষা করা হতো, এমনকি তাঁদের হেনস্থা ও জনসমক্ষে অপমানিতও করা হতো। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনটি ছিল অত্যন্ত উগ্র; আবারও বলি, এর পেছনে রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছিল। তামিলনাড়ুতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরাজয়ের পর, ক্ষমতায় আসা দলটি সর্বদা দ্রাবিড়বাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যা ছিল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে।

একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক—কম্বন রচিত তামিল ভাষার 'কম্ব রামায়ণম' হলো রামায়ণের একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। কম্বনের রামায়ণে প্রচুর তামিল চিন্তাভাবনাও মিশে রয়েছে—উপকূলবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা, পাহাড়, জীবনশৈলী—এই সবকিছুই তাঁর রামায়ণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্রাবিড় আন্দোলন এর তীব্র সমালোচনা করেছিল। আমি নাম উল্লেখ করছি না, তবে একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট তামিল রাজনৈতিক নেতা রামায়ণের কিছু উপাদানের, যা শৃঙ্গার রসের ওপর ভিত্তি করে ছিল, একটি অত্যন্ত অবমাননাকর সংস্করণ লিখেছিলেন। এটি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যাতে মনে হয় রামায়ণ একটি অশ্লীল গ্রন্থ। তারা রামায়ণকে সেই পর্যায় পর্যন্ত কলঙ্কিত করেছিল।

তাই একজন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক তামিল ব্যক্তি বলেছিলেন, "না, আমি এটি মেনে নিচ্ছি না। রাম আমার নায়ক। রাম আমার ঈশ্বর এবং রামায়ণ আমাকে এত ভালো ভালো কথা শেখায় যা আমি চাই আমার সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানুক"। তাই তিনি হিন্দুত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃত বা হিন্দু চিন্তাধারার যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সমগ্র তামিলনাড়ু জুড়ে 'কম্বন কলগম' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বত্র 'কম্বন কলগম' প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই 'কম্বন কলগম' কম্ব রামায়ণ প্রসারে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

একইভাবে রসিকমণি টি.কে. চিদম্বরনাথ উদয়ার নামে আরেকজন লেখক রামায়ণের একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কম্বন থারুম রামায়ণম' লিখেছিলেন, যার অর্থ কম্বনের দেওয়া রামায়ণ। তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন? এমন অনেকেই আছেন। ভাইয়াপুরী পিল্লাই ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত। তিনি একজন সাহিত্য সমালোচকও। তাঁকে নির্বাসিত করা

হয়েছিল। সুতরাং, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী যে ২৮ জনের কথা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আমরা সেই সমস্ত মানুষের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিচ্ছি যাঁদের জাতীয়তাবাদী হওয়ার জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল, ভারত ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে ভাবার জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল।

যে দলটি দ্রাবিড় আন্দোলনেরও অংশ ছিল, ক্ষমতায় আসার পর বাজেট বক্তৃতায় তাদের বলতে হয়েছিল "আমি সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাই। তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় যতগুলো বই প্রকাশ করেছিলেন, তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমরা অর্থ প্রদান করব"। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখন জীবিতও ছিলেন না যখন এই সম্মান পুনরুদ্ধার করা হয়, ততদিনে তাঁদের কেউ কেউ এমনকি প্রতিবাদও করেছিলেন কারণ তাঁদের জাতীয়করণ করা হয়েছিল, তাঁদের বইগুলোর জাতীয়করণ করা হয়েছিল। দ্রাবিড়বাদের কারণে কয়েক দশক ধরে এই হেনস্থার শিকার হওয়া পরিবারগুলোর নিজস্ব ছোট ছোট প্রকাশনা ছিল, যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের ঠাকুরদা বা বাবার লেখা বইগুলো প্রকাশ করতেন, যাঁদের সেই দ্রাবিড় সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাঁরা বলেছিলেন, "আমরাই প্রকাশ করছি। আপনাদের এসে আমাদের কিছু বলার দরকার নেই। আমরা ২০০ কপি বা ৫০০ কপি প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু এটি জাতীয়করণ করার আপনারা কে? আপনারাই তো একে সারাজীবন অসম্মান করে এসেছেন"।

কিন্তু যাই হোক, সেগুলো জাতীয়করণ করা হয়েছিল; তবে স্বাধীন ভারতের দ্বাররক্ষকদের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে আদর্শগত পার্থক্যের জন্য মানুষকে কোণঠাসা করার ইতিহাস এটাই। এঁরা ছিলেন সেইসব মানুষ যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্বের সঙ্গে লিখেছিলেন। এই ২৮ জনকেই ২০০৯ সালের একটি বাজেট বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের সম্মান ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। সুতরাং, দ্বাররক্ষার এই পুরো ব্যবস্থার পেছনে প্রচুর সমর্থন ছিল। আমাকে বলুন, আমাদের মধ্যে কতজন 'সোভিয়েত ল্যান্ড' প্রকাশনা দ্বারা প্রভাবিত হইনি? কী চমৎকার বই, কত সুন্দর সুন্দর বই তারা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল প্রচারণামূলক সামগ্রী এবং এর মধ্যে পুশকিন পড়ে আমি উপকৃত হয়েছিলাম। কী সুন্দর সব ছবি, কিন্তু কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এই সবকিছুর অর্থায়ন করেছিল।

তামিলনাড়ুর প্রতিটি ঘরে ঘরে ভিয়েতনাম যুদ্ধ কেন হচ্ছে তা নিয়ে বই পৌঁছে যেত, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেন আমাদের চাল ও গম আমদানি করার মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল, তা বলার মতো কোনো বই ছিল না। আমাদের তা জানানোর মতো কোনো বই ছিল না। আমি তামিল ভাষায় 'ইয়েন ইন্ধা

ভিয়েতনাম পোর' বইটির কপি পড়েছি, যার অর্থ 'কেন এই ভিয়েত্নাম যুদ্ধ চলছে?'; কিন্তু এই তহবিল যা এই সমস্ত প্রকাশনা এবং সুন্দর কেন্দ্রীয় ভবনটিকে সমর্থন করার জন্য এসেছিল, আমি নিশ্চিত শান্তিশ্রী আমাদের এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলতে পারবেন। এই চমৎকার প্রকাশনাগুলোর মাধ্যমে আপনার মনে অনুপ্রবেশ করার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তা আমার মনে হয় প্রায় ২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের টেনে নিয়ে গেছে এবং অবশ্যই এর পরে অনেক বিক্রম সম্পত তাঁদের নিজস্ব কাজ করছেন।

আমি এটিকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। এটি বিশ্বজুড়ে একটি সাধারণ ধরন। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন—আমি কেরালা সম্পর্কে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রোগ্রেস পাবলিকেশন্স ১৯৬৬ সালে মালয়ালম বিভাগ খোলে, অন্যদিকে কেরালার প্রভাত বুক হাউস প্রচারণামূলক সামগ্রীর বই ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে পাঠানোর জন্য ২৮টি শাখা পরিচালনা করত। এমনকি পল জাকারিয়ার মতো লেখকও একবার মন্তব্য করেছিলেন, "১২ বছর বয়সের মধ্যেই আমি একজন কট্টর কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছিলাম"। ভাবুন শিশুদের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল। আমি আপনাদের তামিলনাড়ুতে কম্বনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এস. গণেশন এর শুরু করা 'কম্বন কড়গম' সম্পর্কে বলেছিলাম, কিন্তু ২০১৩ সালের মতো সাম্প্রতিক সময়েও জো ডি ক্রুজ—আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কতজন তাঁর নাম শুনেছেন, তিনি তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ—'আঝি সুর উলাগম' নামে একটি বই লিখেছিলেন, যার অর্থ 'আঝি' অর্থাৎ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবী।

সাহিত্য অকাদেমি তাঁর পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করার আগেই প্রকাশক বলেছিলেন, "না, না, আমরা আপনার বই প্রকাশ করব না, দুঃখিত" এবং এটি নিয়ে বিশাল তোলপাড় হয়েছিল। কেন, প্রার্থনা করি? তিনি গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছিলেন—একটি অত্যন্ত ভালো প্রশাসন পরিচালনা করা, শিল্পকারখানা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য। তিনি নিজে একটি বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলীয় অঞ্চল, যেখানকার তিনি বাসিন্দা, তা নিয়ে এই চমৎকার বইটি লিখেছিলেন। প্রকাশকরা তাঁর বইটি প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "না, না, আপনি কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এমন প্রশংসা করতে পারেন।" সুতরাং, ২০১৩ সালের মতো সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও এটি চলেছিল।

সেই সোভিয়েত যুগে আন্দ্রেই ঝদানভ ১৯৩৪ সালের আগস্টে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সোভিয়েত সাহিত্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কারণ শ্রেণী সংগ্রামের যুগে এমন কোনো সাহিত্য নেই এবং থাকতে পারে না যা শ্রেণী

সাহিত্য নয়, এবং তাই আমরা প্রকাশ করব।" এটি একটি উন্মুক্ত বিবৃতি বক্তব্য এবং সেই প্রকাশনা কেবল সোভিয়েত ল্যান্ড-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরা এতটাই চরম পর্যায়ে গিয়েছিলেন যে চাইকোভস্কির মতো একজন চমৎকার সুরকারকেও বারবার তকমা দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে অনেক কাটছাঁট করার পর তাঁকে একজন প্রকৃত রুশ প্রতিভাধর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল; তবে প্রথমে তাঁকে বর্জন করা হয়েছিল এবং অনেক ধোয়া-মোছার পর তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

ব্রিটেনেও সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আপনারা রজার স্ক্রুটনকে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে শুনে থাকবেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে ১৯৭৯ সালে তাঁর 'দ্য মিনিং অব কনজারভেটিজম' বইটি প্রকাশ করার ফলে তাঁর শিক্ষাজীবনের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ১৯৭৯ সালের মতো সাম্প্রতিক সময়েও ব্রিটেনে ডানপন্থী ঘরানার লেখালেখি করার জন্য কাউকে কেবল 'দ্য মিনিং...' লেখার অপরাধে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কেমব্রিজ কলেজের লাইব্রেরিতে তিনি মার্ক্স, লেনিন এবং মাও-এর বই পেয়েছিলেন, কিন্তু স্ট্রস, হোয়েগেলিন, হায়েক বা ফ্রিডম্যানের কোনো বই পাননি। তিনি ২০০৩ সালে এ কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন শিক্ষাব্যবস্থায় ডানপন্থীদের প্রান্তিক করে রাখা হয়, গণমাধ্যমে তাদের নিন্দা করা হয় এবং একটি রাজনৈতিক শ্রেণীর দ্বারা তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়;

আর এটি ছিল তাঁর 'ফুলস, ফ্রডস অ্যান্ড ফায়ারব্র্যান্ডস' বইটিতে। তিনি বলেন যে, যুক্তরাজ্যের মতো একটি দেশেও এই ধরনের হয়রানি চলে। মার্গারেট থ্যাচার এর ফলে সৃষ্ট ঐকমত্যকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে এমন কিছুর সন্ধানে সমস্ত বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ এবং আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া হয় যা কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু কেউ তাতে আপত্তিও করে না। মার্গারেট থ্যাচারের পক্ষে এত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরাটা ছিল অত্যন্ত স্বভাবসুলভ। এটি আমার স্মরণ করার মতো একটি বিষয়। এমন কিছুর সন্ধানে সমস্ত বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ এবং আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার প্রক্রিয়া যা কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু কেউ তাতে আপত্তিও করে না।

সুতরাং আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপত্তি জানানোর বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্টভাবে ঘটছে। এখানকার চিন্তাবিদদের কাছ থেকে ঠিক এটাই দাবি করা হয়েছিল। একটি কৃত্রিম রাজনৈতিক ঐকমত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করো অথবা প্রাতিষ্ঠানিক বিলুপ্তির মুখোমুখি হও। আমরা দশকের পর দশক ধরে তা দেখেছি। এই দ্বাররক্ষণ এখনও চলছে। আমার বলার প্রয়োজন নেই। এখানেই দেখুন, ডক্টর বিক্রম সম্পত ইতিহাসে ডক্টরেট থাকা এবং রয়্যাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির একজন নির্বাচিত ফেলো

হওয়া সত্ত্বেও, যাঁর বহু খণ্ডের কাজ হাজার হাজার প্রাথমিক দলিল এবং ১০০টি ব্যক্তিগত নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, তাঁকে একজন অ-ইতিহাসবিদ, একজন জনপ্রিয় লেখক এবং একজন অপেশাদার হিসেবে খারিজ করার সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, কারণ তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলো মিলে যায়নি।

এই দ্বাররক্ষকদের বার্তা এর চেয়ে স্পষ্ট হতে পারত না। আপনি ডক্টরেট হোন না কেন, আপনার কাজের দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ হোক না কেন, তাদের সদস্যপদ কার্ড ছাড়া আপনি মঞ্চে উঠতে পারবেন না। এই একই দ্বাররক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে আসীন থাকেন এবং সেইসব কমিটিতে বসেন যা সিদ্ধান্ত নেয় একটি শিশু কী পড়বে আর কী পড়বে না। কোন গবেষণায় অর্থায়ন করা হবে এবং কোনটিতে গোপনে অর্থায়ন করা হবে না, তা তারাই ঠিক করে। তারা বিদেশী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেখেন। তারা বিদেশী সংবাদপত্রে এমন একটি দেশ সম্পর্কে লেখেন যা তারা ইতিমধ্যেই বিচার করে ফেলেছেন এবং আমি যে 'মেশিনারি'র কথা বর্ণনা করছি, তারা ঠিক তারই উত্তরাধিকারী। কমিনটার্ন চলে গেছে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল চলে গেছে। কিন্তু এটি আমাদের মাঝে যে অভ্যাস রেখে গেছে, তা যায়নি। সেই অভ্যাসটি হলো প্রমাণকে কী বলতে দেওয়া হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া এবং তারপরে যে কেউ সেই প্রমাণকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে প্রতিপক্ষের পরিবর্তে শত্রু হিসেবে গণ্য করা।

এটি হলো বিচারের আগেই রায় ঘোষণা করা এবং তাই, পরিশেষে, আজ আমি কী চাইছি? আমরা মঞ্চের এক পক্ষকে নীরব করতে বলছি না, বা আমরা মূলত এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে সরে যেতেও আগ্রহী নই। একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখে অভিনেতারা যদি কেবল পক্ষ পরিবর্তন করে, তবে কিছুই মুক্ত হয় না, কেবল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটে। যখন বিপরীত ঘরানার একটি চলচ্চিত্র যেমন 'ঘটশ্রাদ্ধ'—আপনারা হয়তো এর নাম শুনে থাকবেন—তৈরি হয়েছিল, ভারত তা দেখেছিল। ভারতের কেউ কেউ এর প্রশংসা করেছিলেন এবং কেউ কেউ এমনকি এটি উদযাপনও করেছিলেন। সেই উদারতা পারস্পরিক হতে হবে।

সেই উদারতা পারস্পরিক হতে হবে। আমরা পুরো মঞ্চটি পুনরুদ্ধার করার দাবি জানাচ্ছি। বাম দিকে জায়গা, ডান দিকে জায়গা এবং মাঝখানে একটি উন্মুক্ত কেন্দ্র যেখানে সমস্ত মতাদর্শের চিন্তাবিদরা মিলিত হতে পারেন। এমন এক সচেতন জনসাধারণের সামনে ধারণার সংঘাত ঘটুক, যাদের ওপর নিজেদের মতো করে প্রমাণ যাচাই করার ভরসা রাখা যায়। আজকের ভারত আত্মবিশ্বাসী এবং এ নিয়ে তার কোনো দ্বিধাবোধ নেই, আর আমরা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য অন্য কারও অনুমতির অপেক্ষা করা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা আমাদের শিলালিপিগুলো আবার পড়ছি,

আমাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ে কাজ করছি, আমাদের গণিতে ফিরে যাচ্ছি, এবং এই গল্পগুলো সত্যিকারের আনন্দের পাশাপাশি প্রকৃত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তুলে ধরছি। আমার মনে হয়, উপনিবেশমুক্তকরণ বা ডিকলোনাইজেশনের অর্থ এটাই হওয়া উচিত।

এটি কেবল একটি নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বদলে অন্য আরেকটি পাঠ্যবই প্রতিস্থাপন করার বিষয় হতে পারে না। এর অর্থ হতে হবে আরও বিস্তৃত আর্কাইভ, আরও বেশি ভাষা, আরও কঠিন প্রশ্ন এবং গবেষকদের আরও বড় একটি বৃত্ত যাদের লেখা প্রকৃতপক্ষে পড়া হয়। সর্বোপরি, এর অর্থ হওয়া উচিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই ঠিক করে দিতে পারবে না যে প্রমাণকে কী বলতে দেওয়া হবে। ইতিহাসবিদ, ঔপন্যাসিক, অলংকরণকারী এবং গল্পকারদের মতো বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বরকে আজ সম্মান জানানোর উদ্দেশ্য এটাই। এরা হলেন নতুন কণ্ঠস্বর যারা মঞ্চে পা রাখছেন। ডক্টর বৈরাপ্পা তাঁর ৯৫ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি হয়তো অভ্রান্ত ছিলেন না এবং তিনি অভ্রান্ত ছিলেন এমন ভান করে আমরা তাঁকে সম্মান জানাই না। তবে, তিনি ছিলেন গভীরভাবে সৎ এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বড় ধরনের মূল্য চুকিয়েও তিনি এই সততা বজায় রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পেশাকে সহজভাবে সংক্ষেপ করেছিলেন এভাবে—সাহিত্যের কাজ হলো মানুষের সংবেদনশীলতাকে পরিশীলিত করা। আমি এটি অনুবাদ করেছি। তিনি কখনই অনুসারীদের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে চাননি। তিনি মানুষ যেভাবে সত্যকে উপলব্ধি করে, তাকে পরিশীলিত করতে চেয়েছিলেন। সত্য মত্তু সৌন্দর্য—সত্য এবং সুন্দর। আমাদের মতো একটি প্রাচীন সভ্যতার জন্য এটি সত্যিই বৌদ্ধিক স্বরাজের একটি কাজ। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ, আপনি ঠিকই বলেছিলেন যে ৯১ সালে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় কেবল এখনই বৌদ্ধিক স্বাধীনতা শক্তি সঞ্চয় করছে। তাই বৌদ্ধিক স্বাধীনতাকে আমাদের নিজেদের জানার অধিকার দিতে হবে। আজ ৫ই সেপ্টেম্বর আমাদের শিক্ষকদের এবং আজ ডক্টর বৈরাপ্পার মতো চিন্তাবিদদের প্রতি আমরা যে সেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পারি, তা হলো ভারতের বৌদ্ধিক মঞ্চের উভয় পার্শ্বমঞ্চকে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত রাখা যাতে অভিনয় চলতে পারে। এই মন্থন চলতে থাকুক এবং প্রমাণ, যৌক্তিক কঠোরতা ও জাগ্রত বিবেক শেষ কথা বলুক এবং আসুন আমরা সবাই মিলে ভারতকে বৌদ্ধিক স্বরাজের এই সুবর্ণ যুগে এগিয়ে নিয়ে যাই।

আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

ANNUAL HISTORY PRIZES

Awards Ceremony

&

The Dr. S. L. Bhyrappa Memorial Lecture

Powered by